بسم الله الرحمٰن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়দনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ মোতাবেক ৯ ফাতাহ্, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

যাদের চোখ পর্দায় আবৃত, যারা সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে যে, 'আমরা মানবো না', ঐশী সমর্থন ও নিদর্শন তাদের চোখেও পরে না। নবীদের যারা অস্বীকার করেছে, তাদের চিরাচরিত রীতি হল, নিদর্শনাবলী দেখার পরও তারা বলে, 'আমাদেরকে নিদর্শন দেখাও'। তারা সীমাতিক্রম করায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে মোহর মেরে দেন। তারা সত্যকে আর পেতেই পারে না। অনেক সময় নবীর সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিজেদেরকেই শিক্ষণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক নিদর্শনে পরিণত করে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীরাও এরূপ ছিল, দেখা সত্ত্বেও হঠকারিতা বশতঃ কোন নিদর্শনই তাদের চোখে পড়ত না। ফলে এমন অনেক 'আয়ীম্মাতুল কুফর' অর্থাৎ, কাফিরদের সর্দারই নিদর্শনে পরিণত হয়েছে।

স্বীয় দাবির সমর্থনে আল্লাহ্ তা'লার দেখানো অনেক নিদর্শনের কথা উল্লেখ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, এই-এই নিদর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে আর একইভাবে মহানবী (সা.)-এর উল্লিখিত নিদর্শনাবলীর কথাও উদ্ধৃত করে বলেছেন, তিনি (সা.) এ সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যার মধ্য থেকে এটি-এটি পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু বিরোধী এ সব ধর্মীয় নেতা নিজেরাও মানে নি আর সাধারণ মানুষকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর এরই ধারাবাহিকতা এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ সব নিদর্শনের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) জামা'তের সত্যতার স্বপক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) যে সব নিদর্শনের কথা বলেছেন, সেগুলো বর্ণনা করার সময় বলেছেন, মহানবী (সা.)ও এগুলোকে নিদর্শনই আখ্যা দিয়েছেন। সেগুলোর একটি নিদর্শন হল, 'কুসুফ ও খুসুফ' অর্থাৎ, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন। তিনি (আ.) বলেন, এ নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মৌলভীরা কেঁদে কেঁদে এ হাদীস পাঠ করত কিন্তু এটি যখন পূর্ণতা লাভ করল, কেবল একবার নয়, বরং দু'বার পূর্ণ হল, একবার দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে পূর্ণতা লাভ করল এবং দ্বিতীয়বার আমেরিকায়, তখন যারা এ নিদর্শনটি দেখতে চাইত, তারাই তাদের ভোল পাল্টে ফেলল। যেহেতু নিদর্শনটি প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল, তাই তারা এটি অস্বীকার করতে পারে নি, কিন্তু হঠকারিতা এবং গোঁয়ারতুমি এক্ষেত্রে বাদ সাধে। তিনি (আ.) বলেন, আমার এক বন্ধু বলেছেন, এ নিদর্শন পূর্ণতা লাভের পর গোলাম মোর্তুজা নামের এক মৌলভী চন্দ্রগ্রহণের সময় তার নিজের রানে হাত চাপড়ায় অর্থাৎ, তার মনের দুঃখ ও কষ্ট প্রকাশ করতে গিয়ে বলে, এখন পৃথিবীর মানুষ পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। তিনি (আ.) বলেন, দেখ! বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে সে-ই কি বেশি হিতাকাঙ্খী ছিল? অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমর্থনে প্লেগের নিদর্শন প্রকাশিত

হয়েছে। পবিত্র কুরআনে খাল খনন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। নতুন জনবসতি গড়ে উঠার সংবাদ রয়েছে। পাহাড় বিদীর্ণ করার সংবাদ রয়েছে। বই-পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশের নিদর্শন আর নতুন বাহনের কথাও রয়েছে। এককথায়, বহু নির্দশনের কথা তিনি (আ.) উল্লেখ করেছেন, যার সংবাদ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে আর মহানবী (সা.)ও দিয়েছেন। **(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮, সংকলন ১৯৮৫ইং, যুক্তরাজ্যে মুদ্রিত)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মানুষ আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী এবং ঐশী সমর্থন দেখার পরিবর্তে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে আর এমন সব তুচ্ছ ও অযৌক্তিক আপত্তি করে, যা অদ্ভূত ও হাস্যঙ্কর। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উপর্যুপরি নিদর্শন দেখিয়েছেন। এমন কতেক মানুষও আসত, যারা এসে আপত্তির ছলে বলত, তাঁর পাগড়ি বাঁকা, ইনি কীভাবে মসীহ্ মওউদ হতে পারেন? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, তিনি নিদর্শনের পর নিদর্শন দেখিয়েছেন, কিন্তু এমন কিছু মানুষও আসত, যারা বলত, এ ব্যক্তি সঠিকভাবে 'ক্বাফ' উচ্চারণ করতে পারে না, ইনি কীভাবে মসীহ্ মওউদ হলেন? তিনি লাগাতার নিদর্শন দেখিয়েছেন, কিন্তু এমন মানুষও এসেছে, যারা বলত, তিনি স্ত্রীর জন্য অলঙ্কার বানিয়েছেন, তিনি বাদামের তেল ব্যবহার করেন, তাকে আমরা কীভাবে মানতে পারি? এই ছিল তাদের আপত্তি। তিনি (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলী দেখে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিও না, চোখ বন্ধ করে থেকো না। অনেকেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এসে বলত, কোন নিদর্শন দেখান। তিনি (আ.) বলতেন, পূর্বের নিদর্শনাবলীকে কতটা কাজে লাগিয়েছ যে, এখন আরো নিদর্শন দেখানোর দাবি করছো? ইতিপূর্বে সহস্র-সহস্র নিদর্শন থেকে যেখানে উপকৃত হও নি, তখন অন্য কোন নিদর্শন দেখে কীভাবে লাভবান হবে? এমন মানুষ সব সময় বঞ্চনারই শিকার হয়। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৪-২২৫)**

এমন একটি অসাধারণ নিদর্শন, যা প্রতিদিন পূর্ণতা লাভ করে, সেটির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বারাহীনে আহমদীয়া পুস্তকে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছেন অর্থাৎ, ইলহাম করে বলেছেন, '**রাব্বী লা তাযারনী ফার্দাও ওয়া আন্‌তা খাইরুল ওয়ারেসীন।**' অর্থ- হে আল্লাহ্! আমাকে তুমি নিঃসঙ্গ রেখো না, বরং এক জামা'তে পরিণত কর। তিনি নিজেই এই অনুবাদ করেছেন। অন্যত্র বলেন, '**ইয়াতিকা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব**।' অর্থ- তোমার কাছে চতুর্দিক থেকে অর্থকড়ি ও বিভিন্ন সামগ্রী, যা অতিথিদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তা সরবরাহ করবেন আর সকল দিক থেকেই তা তোমার কাছে আসবে। তিনি (আ.) আরো বলেন, '**ইয়াতুনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক্ব**।' সকল পথ এবং দিক থেকে তোমার কাছে অতিথিরা আসবেন। তিনি বলেন, ২৬ বছর পূর্বের এ ভবিষ্যদ্বাণী, **(মলফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৬১)** যখন তিনি এটি বর্ণনা করেছেন, যা আজও অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণতা লাভ করে চলছে। এটি জামা'তের উন্নতি সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী, অতীতকাল থেকে আমরা দেখে আসছি আর আজও এটি মহা-মহিমার সাথে পূর্ণ হচ্ছে। তাঁর জামা'তের প্রতিনিয়ত উন্নতি করা এবং আর্থিক কুরবাণীর ক্ষেত্রে মানুষের উন্নতি করা,

এটি তাঁর সত্যতার অসাধারণ একটি প্রমাণ ও নিদর্শন। কিন্তু এগুলো কেবল সে-ই দেখে, যার দেখার মত চোখ আছে। অন্ধরা তো দেখার যোগ্যতাই রাখে না।

আহমদীয়াতের বিজয় এবং জামা'তের উন্নতি সম্পর্কিত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় ইলহামের প্রেক্ষাপটে যে সব ঘটনা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর কয়েকটি এখন আমি উল্লেখ করছি।

তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কেও আল্লাহ্ তা'লা বার বার অবহিত করেছেন যে, আহমদীয়া জামা'তকেও সেভাবেই কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, যেভাবে পূর্বের নবীদের জামা'তকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। একবার তিনি [অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)] স্বপ্নে দেখেন, আমি নিযাম উদ্দীনের ঘরে প্রবেশ করেছি। নিযাম উদ্দীনের অর্থ হল, ধর্মীয় ব্যবস্থাপনা। এ স্বপ্নের অর্থ হল, অবশেষে আহমদীয়া জামা'ত একদিন ধর্মীয় ব্যবস্থাপনায় রূপ নিবে আর পৃথিবীর সকল ব্যবস্থাপনার উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে, ইন্‌শাআল্লাহ্। কিন্তু এ বিজয় কীভাবে অর্জিত হবে? এ সম্পর্কে স্বপ্নে তিনি স্বয়ং বলেন, এই ঘরে আমরা কিছুটা হাসানের রীতি অবলম্বন করে প্রবেশ করব এবং কিছুটা হোসাঈনের রীতি অবলম্বন করে প্রবেশ করব। সবাই জানে, হযরত হাসান (রা.) যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তা তিনি সমঝোতার মাধ্যমে অর্জন করেছেন আর হযরত হোসাঈন (রা.) সাফল্য পেয়েছেন শাহাদাতের মাধ্যমে।

অতএব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে, নিযাম উদ্দীনের পর্যায়ে জামা'ত অবশ্যই পৌঁছবে, কিন্তু তা কিছুটা প্রেম-প্রীতি ও সমঝোতার মাধ্যমে আর কিছুটা শাহাদত এবং কুরবানীর পথ অতিক্রম করে। যদি আমাদের কেউ একথা মনে করে যে, মীমাংসা এবং সমঝোতার পথ পাড়ি না দিয়েই জামা'ত উন্নতি করবে, তবে তারা ভুল করে। আর যদি কোন ব্যক্তি এ কথা মনে করে যে, কুরবানী এবং শাহাদাত ছাড়াই এ জামা'ত উন্নতি করবে, তারাও ভুল করে। কখনো মীমাংসা এবং শান্তির দিকে যেতে হবে, আবার কখনো হোসাঈনের রীত অবলম্বন করতে হবে। এর অর্থ হল, শত্রুর মোকাবিলায় প্রাণ বিসর্জন দিতে হলেও দেব, তবুও তাদের সামনে মাথা নত করব না। এ উভয় রীতি আমাদের জন্য অবধারিত। আমাদের জন্য কেবল মসীহ্‌র রীতিই অবধারিত নয়, আবার মাহদীর রীতিও নির্ধারিত নয়। বরং একটি মধ্যবর্তী পথ আমাদের অবলম্বন করতে হবে। একটি বিজয় আসবে প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার পথ বেয়ে এবং আরেকটি বিজয় আসবে কুরবানীর রাজপথ পাড়ি দিয়ে, এরপর জামা'ত নিযাম উদ্দীনের গৃহে প্রবেশ করবে এবং সাফল্য অর্জন করবে। **(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৩)** এই উভয় কথারই দৃষ্টান্ত আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যা জামা'তের সদস্যরা প্রদর্শন করে যাচ্ছে। সমঝোতা এবং শান্তি ও সৌহার্দের বার্তাও আমাদের পক্ষ থেকে প্রকাশ পাচ্ছে আর ধর্মের জন্য জামা'ত ত্যাগও স্বীকার করছে।

তিনি (রা.) আরেক স্থানে বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়েছে এবং তাঁকে যা দেখানো হয়েছে, তা পূর্বে বর্ণিত ইলহামেরই আরো খানিকটা অংশবিশেষ। মসজিদে মুবারক সংলগ্ন যে ঘর রয়েছে, (এটি ছিল নিযাম উদ্দীনের ঘর।) এতে আমরা কিছুটা হাসানের রীতি

অবলম্বন করে প্রবেশ করব এবং বাকিটা করব হোসাঈনের পথ অবলম্বন করে। অনেকেই বিস্মিত হয়ে ভাবত, এই ইলহামের অর্থ কী? মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, তিনি (আ.) বলতেন, এ ইলহামের অর্থ কী, তা জানা নেই? কিন্তু যথা সময়ে ইলহামের অর্থ প্রকাশ পায়। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯-৪০)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে যখন একজন মানুষও ছিল না, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবহিত করেছেন, তোমার জামা'ত এত উন্নতি করবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি সেভাবেই থেকে যাবে, যেভাবে আজ প্রাচীন যাযাবর জাতিগুলো রয়েছে। **(মিনহাজুত তালেবীন, আনোয়ারুল উলুম, ৯ম খণ্ড, পৃ. ২১৩)**

ঐশী সমর্থনের নিত্যনতুন দৃশ্য ও দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই আমরা প্রত্যক্ষ করি। ইন্‌শাআল্লাহ্, সেদিন অবশ্যই আসবে, যখন এ দৃশ্যও চোখে পড়বে যে, আহমদীয়া জামা'ত এতটাই উন্নতি করবে যে, এর তুলনায় অন্যান্য জাতির অবস্থা ও অবস্থান খুবই নগণ্য হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের জীবনে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে ধর্মীয় চেতনা ও প্রেরণা সঞ্চারিত করতে হবে, যার কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এ দৃশ্য দেখাবেন। যেখানে ঐশী সাহায্য ও সমর্থন থাকে, সেখানে বিরোধীতাও হয়। আর নবীদের জামা'তের সাথে সব সময় এমনটিই হয়ে আসছে। কিন্তু এই বিরোধিতা আমাদেরকে ভীত এবং ত্রস্ত করতে পারে না। বরং ঈমানকে আরো দৃঢ় করে, ঈমান বৃদ্ধির কারণ হয়।

কয়েক দিন পূর্বে রাবওয়ার তাহরীক জাদীদের অফিসে এবং জিয়াউল ইসলাম প্রেসে সরকারের পুলিশ বাহিনীর বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, যাদেরকে কাউন্টার টেরোরিস্ট পুলিশ বলা হয়, যাদেরকে সন্ত্রাসীদের সাথে লড়াইয়ের জন্য এবং সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য গঠন করা হয়েছে, তারা অপ্রত্যাশিতভাবে হানা দিয়ে দু'জন মুরব্বী এবং কয়েকজন কর্মীকে আটক করেছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রাবওয়া থেকে কেউ কেউ আমার কাছে পত্র লিখেছেন, যাদের মাঝে মহিলাও রয়েছেন। তাদের বক্তব্য হল, আমরা এমন আচরণে ভয় পাই না, বরং আমাদের ঈমান দৃঢ় আছে আর এরূপ ঘটনা দেখার পর সর্বদাই আরো দৃঢ়তা লাভ করে। আর আমরা সকল প্রকার সমস্যা মোকাবিলা করবো এবং ত্যাগ স্বীকার করবো। এটি সেই প্রকৃত চেতনা ও প্রেরণা, যা মু'মিনের মাঝে থাকা উচিত। এ সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের এমন কুরবানী দিতে হবে। খোদার প্রতিশ্রুতি এবং অপরিসীম সাহায্য ও সমর্থনের চিত্র আমরা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করি। নিঃসন্দেহে চূড়ান্ত বিজয় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের জন্যই নির্ধারিত। বিরোধিতা তো হতেই থাকে আর হবেও। যারা হামলা করে বা হানা দেয় (হামলা নয়, বরং বলা উচিত হানা দিয়েছে) এ সব হতভাগার সবচেয়ে বড় ভয় এবং ত্রাস আহমদীদের পক্ষ থেকে বলে মনে হয়। কেননা, আহমদীরা বলে, হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি কর, খোদাকে ভয় কর। আহমদীরা বলে, খোদার শাস্তি থেকে আত্মরক্ষা কর এবং তাঁকে ভয় কর। এদের মতে আহমদীরা এমন (দুঃসাহসী) কথা কীভাবে বলতে

পারে? এরা খোদা সম্পর্কে আমাদের ভয় দেখায়! অতএব, এরচেয়ে বড় সন্ত্রাসী আর কে আছে, যে আমাদেরকে খোদা সম্পর্কে ভয় দেখায়! কাজেই, এদেরকে ধর আর নিশ্চিহ্ন কর।

আল্লাহ্ তা'লা এদেরকে কান্ডজ্ঞান দান করুন। এদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দিন, তাদের বোধোদয় ঘটুক। দেশ ও জাতিকে এ সব মৌলভীদের খপ্পর থেকে রক্ষা করুন, যারা প্রকৃত অর্থে সন্ত্রাসী, যারা দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। কোন প্রাণ এদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এই যে বিশেষ পুলিশ বাহীনি, সন্ত্রাস দমনকারী পুলিশ, তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা সৎসাহস দিন, তারা যেন শান্তিপ্রিয় এবং দেশ-প্রেমিক ও দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আহমদীদের দিকে হাত না বাড়িয়ে এর পরিবর্তে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদেরকে গ্রেফতার করে, যাদের হাত থেকে জনসাধারণের জীবন নিরাপদ নয় এবং যারা দেশের মূলে কুঠারাঘাত করে চলেছে। আর তাদেরকেও, যারা দু'হাতে দেশের সম্পদ লুটপাট করছে। আহমদীদের দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা পাকিস্তানের সুরক্ষা করুন। এসব অত্যাচারীর হাত থেকে রক্ষা করুন। আর কুরবানীর যতটুকু সম্পর্ক, আহমদীরা তো তা দিয়েই আসছে আর ভবিষ্যতেও দিবে। এসব কুরবানী অচিরেই ফল বয়ে আনবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

অনুরূপভাবে, আলজেরিয়াতেও সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের উপর অনেক জোর-যুলুম এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন চালানো হচ্ছে। খোদা তা'লা তাদেরকেও নিরাপদ রাখুন এবং দৃঢ়তা দান করুন। সেখানকার সরকারকেও আল্লাহ্ তা'লা কান্ডজ্ঞান দিন। তারাও যেন আহমদীদের প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে যে, এরা শান্তিপ্রিয় এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অপবাদ আরোপ করা হয়, আহমদীরা সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বা এরা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায় অথচ সারা পৃথিবীতে কোন স্থানে কোন আহমদী কখনো দেশীয় আইনের বিরুদ্ধে এবং সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না। বরং আমরা প্রেম-প্রীতি এবং ভালোবাসার প্রচার ও প্রসার করি। হ্যাঁ, এর জন্য যদি ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, তবে তাও করব, ইন্‌শাআল্লাহ্।

পুনরায়, আমি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর উদ্ধৃতির দিকে ফিরে আসছি। তিনি (রা.) বলেন, "পৃথিবীতে সবচেয়ে ভয়াবহ বিরোধিতা হয়, শরিক বা অংশীদারদের পক্ষ থেকে।" পাঞ্জাবীতে প্রসিদ্ধ আছে, **'কষ্ট করে হলেও নিজের অংশ আদায় করতে হবে।'** অতএব, সবচেয়ে বড় বিরোধিতা আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। কেননা, তারা সহ্যই করতে পারে না যে, তাদেরই মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বিশ্বের বুকে দাঁড়িয়ে যাবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান লাভ করবে। যারা এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য সংগ্রাম করে, যুদ্ধ করে, তারা কীভাবে সহ্য করতে পারে যে, সারা পৃথিবী তাঁর দারস্থ হবে। তাই তারা তাকে দমনের সকল চেষ্টা করে। এমনকি, যখন তারা অসহায় হয়ে আর কিছুই করে উঠতে পারে না, তখনও তারা কোন না কোনভাবে হৃদয়ে পুষে রাখা বিদ্বেষ প্রকাশের চেষ্টা করে। তিনি (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, শাহ্ কোটের রঈসদের কোন একজন যখন খান বাহাদুর উপাধি লাভ করে, তখন সেই বংশেরই এক মহিলা, যে খুব দরিদ্র ছিল, সে তার ছেলের নাম রাখে, খান বাহাদুর। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, এটি কী করলে, এই নাম রাখার কারণ কী? সে বলে, জানি না আমার ছেলে বড় হয়ে কী হবে, কিন্তু মানুষ

যখন নাম ধরে ডাকবে, তখন তার স্ববংশীয়কে যেভাবে খান বাহাদুর বলবে, অনুরূপভাবে আমার ছেলেকেও খান বাহাদুর বলেই ডাকবে। এই হল অবস্থা, যাদের পক্ষে অন্য কিছু করা সম্ভব হয়ে উঠে না, তারা অন্ততঃপক্ষে অনুরূপ নাম ধারণের ব্যর্থচেষ্টা করে। কাজেই, তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেন, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্য থেকেও এক ব্যক্তি ইমাম হওয়ার দাবি করে। (জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কথা হচ্ছে। আত্মীয়-স্বজনের একজন ভাবল, তিনি দাবি করেছেন আর জগতের মানুষ তার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, তাই আমিও দাবি করি।) হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ফার্সীর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, **"প্রত্যেক ব্যক্তির চিন্তা-ধারা তার নিজ সাহস এবং ধারণা অনুসারেই হয়ে থাকে।"** তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো দাবি করেছেন, আমি সমগ্র বিশ্বের জন্য 'হাকাম' বা ন্যায়-বিচারক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। কেবল সাধারণ শ্রেণীর লোকদের জন্যই নয়, বরং বড় বড় রাজা-বাদশাহ্র জন্যও আমার আনুগত্য করা আবশ্যক। কিন্তু তাঁর আত্মীয়ের নাম রাখাটাই ছিল, বড় বিষয়। তাঁর আত্মীয় দাবি তো করেছেন, কিন্তু সেই দাবি করেছেন, মেথরদের ইমাম হওয়ার। অপর দিকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করে এটিও লিখে দিয়েছেন, ইংল্যান্ড-এর বাদশাহ্র জন্যেও আমাকে গ্রহণ করা আবশ্যক। তাই তিনি নিজেই পত্র লিখে রাণীকে পাঠিয়ে দেন। কেননা, তখন ইংল্যান্ডের রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন রানী। পক্ষান্তরে মেথরদের ইমাম হওয়ার দাবিকারীর সৎসাহস এবং তার অনুসারীদের অবস্থা দেখুন! ওসি বা থানার পুলিশ কর্মকতা এসে তাকে যখন জিজ্ঞেস করে, তুমি কি কোন দাবি করেছ? সে বলে, না! আমি তো কোন দাবি করি নি। কেউ হয়তো এমনিতেই মিথ্যা রিপোর্ট করেছে। অতএব, সবচেয়ে কঠোর বিরোধিতা হয়ে থাকে জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮-৩৯)**

তিনি (রা.) বলেন, আত্মীয়-স্বজনরা যখন বিরোধিতা করে, তখন তা চরম আকার ধারণ করে। আর এ জন্য তারা বৈধ-অবৈধ সকল পন্থায় ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করে। এ বিষয়টি উল্লেখ করার পর তিনি (রা.) বলেন, আমাদের বেশ কয়েক ডজন এমন আত্মীয় রয়েছেন, যারা আমাদের সাথে আহমদীয়াতের কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। এ কারণে নয় যে, আমরা তাদের সাথে মেলামেশা করা পছন্দ করতাম না, বরং তারা আমাদের সাথে মেলামেশা রাখতে চাইত না। আমাদের বংশের মানুষ আমাদেরকে গালি দিত। আমাদের জেঠী-মা, যিনি পরে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, তিনি আমাদেরকে অনেক আজে-বাজে কথা বলতেন। একবারের কথা আমার মনে আছে, যখন আমার বয়স ছয় বা সাত বছর, তখন আমি সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে পাঞ্জাবীতে বারবার বলেন, **যেমন কাক, তেমনি তার ছানা**। আর এ বাক্যটি তিনি এতবার পুনরাবৃত্তি করেছেন যে, আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আমি ঘরে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, এর অর্থ কী? আমাকে জানানো হয়, তোমাকে বলা হয়েছে, তোমার পিতা যেমন খারাপ, তুমিও তেমনই। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে কাদিয়ানে বয়কট করা হয়েছে, মানুষকে তাঁর গৃহকর্ম করতে বাঁধা দেয়া হতো, কুমারদের বাঁধা দেয়া হতো, মেথরদেরকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে বাঁধা দেয়া হতো। আমাদের প্রিয় ভাই, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী এবং অন্যান্য প্রিয় আত্মীয়-স্বজন, এমনকি

তাঁর মামাত ভাই আলী শের, তারা বিভিন্ন প্রকার কষ্ট দিত। তিনি (রা.) বলেন, একবার গুজরাটের কিছু বন্ধু, যারা সাত ভাই ছিলেন, তারা কাদিয়ান আসেন এবং বাগানের দিকে এ জন্য যান যে, বাগানটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বলে আখ্যায়িত হতো। অর্থাৎ, তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাগান দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমাদের এক আত্মীয় বাগানে কাজ করছিলেন। তিনি (অর্থাৎ, আত্মীয়টি) তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কোথা থেকে এসেছ এবং কী উদ্দেশ্যে এসেছ? গুজরাট থেকে আগত অতিথিরা বলেন, গুজরাট থেকে এসেছি আর হযরত মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছি। তিনি বলেন, দেখ! আমি তাঁর মামাত ভাই, আমি খুব ভাল করে জানি, কেমনতর মানুষ সে। তাদের একজন, যিনি সবার সামনে ছিলেন, তিনি আরো এগিয়ে গিয়ে তাকে জাপটে ধরেন এবং (অন্য) ভাইদেরকে তাড়াতাড়ি আসার জন্য ডাকতে থাকেন। এর ফলে সেই ব্যক্তি ভয় পেয়ে যায়। তখন সেই আহমদী বলেন, আমি তোমাকে মারব না, কারণ তুমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আত্মীয়। আমি আমার ভাইদেরকে তোমার চেহারা দেখাতে চাই। কেননা, আমরা শুনতাম যে, শয়তান দেখা যায় না, কিন্তু আজকে আমি স্বচক্ষে দেখছি, সে এমন হয়। **(দৈনিক আল্ ফযল, ৪ ডিসেম্বর ১৯৩৫, ২৩তম খণ্ড, সংখ্যা ১৩২, পৃ. ৩-৪)**

এরপর তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জানানো হয়েছে, তুমি ছাড়া এ বংশের বাকি সবার বংশ-ধারা কর্তিত হবে। [বিরোধিতা এবং যথাসম্ভব সবকিছুই করা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছেন, এই বংশধারা তোমার মাধ্যমেই চালু থাকবে আর বাকি সবার বংশের ধারা কর্তিত হবে।] এমনটিই হয়েছে। এই বংশের এখন কেবল তারাই অবশিষ্ট আছেন, যারা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন। বাকি সবার বংশ-ধারা কর্তিত হয়েছে। যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেন, তখন এই বংশে প্রায় ৭০ জন পুরুষ সদস্য বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৈহিক বা আধ্যাত্মিক সন্তানরা ছাড়া বাকি ৭০জনের একজনেরও কোন সন্তান নেই। যদিও তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নাম মুছে ফেলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে আর নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। কিন্তু ফলাফল কী হয়েছে? ফলাফল হল, তারা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এবং তাদের বংশ-ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এটিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার এক অসাধারণ প্রমাণ। **(খুতবাতে মাহমুদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯)**

জেঠীমা সাহেবার বয়আতের ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (রা.) বলেন, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী এবং নিদর্শন আপাতঃদৃষ্টিতে সামান্য মনে হয়। কিন্তু এগুলোর পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অভিনিবেশকারী মানুষের জন্য এতে এমন অনেক বিষয় নিহিত থাকে, যা ঈমানকে অনেক সমৃদ্ধ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, এটি আমি গতকালই জানতে পেরেছি। যদিও তা এক ব্যক্তি এবং তার অবস্থা সংক্রান্ত ইলহাম, তথাপি এতে বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত রয়েছে। কয়েক বন্ধু বলেছেন, তারা পূর্ব থেকেই জানতেন কিন্তু আমি গতকালই জেনেছি। গতকাল জেঠীমা সাহেবার মৃত্যুর সময় শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব বলেছেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরোনো একটি ইলহাম আছে আর তা হল, **'তাঈ আঈ'**। অর্থাৎ, জেঠীমা এসেছেন। [তিনি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর জেঠীমা ছিলেন। মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বড় ভাইয়ের স্ত্রী। অতএব, তিনি (রা.) বলেন, **'তাঈ আঈ'** একটি পুরোনো

ইলহাম।] এ সম্পর্কে প্রবীণ আহমদীরা বলেন, তখন এর অর্থ বোঝা কঠিন ছিল। কেউ এক অর্থ করত, আবার অন্য কেউ করত অর্থ। কিন্তু এ বাক্যের সোজা সরল অর্থ হবে, এমন কোন মহিলা, যার সাথে জেঠীমার সম্পর্ক থাকবে, তিনি আসবেন। আসার দু'টি অর্থ থাকতে পারে, কাছে আসা বা জামা'তভুক্ত হওয়া। শুধু আসা কোন ভবিষ্যদ্বাণী হতে পারে না। কেননা, আত্মীয়-স্বজন তো এসেই থাকে। আমাদের এখানে বয়োজ্যেষ্ঠ সবাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবীকে জেঠীমা বলেই ডাকতেন, যেন তার নামই ছিল জেঠীমা। যারা জামা'তের বই-পুস্তক পাঠ করে, তারা জানে মোহাম্মদী বেগম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর যুগে তিনি চরম বিরোধী ছিলেন। (অর্থাৎ, এই জেঠীমা সাহেবা ঘোর বিরোধী ছিলেন।) যেহেতু তিনি তার বংশে সবার বড় ছিলেন আর ভবিষ্যদ্বাণীও তার বোনের কন্যা সংক্রান্ত ছিল, তাই বংশের নেতা হওয়ার সুবাদে এই সম্পর্কের পথে বাদ সাধা নিজের জন্য তখন অপরিহার্য দায়িত্ব মনে করতেন। কেননা, তিনি এটিকে তার বংশের সম্মান হানির কারণ মনে করছিলেন। তার দৃষ্টিতে বিরোধিতা করাটা ছিল তার গুরুদায়িত্ব। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নারীর প্রকৃতিতে বড় মহিলার জন্য সম্মান এবং পারিবারিক মর্যাদাকে সকল ধর্মীয় বিষয়, বরং সমস্ত রাজনৈতিক এবং অন্যান্য অবস্থার তুলনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। তার (অর্থাৎ, জেঠীমার নিকট) তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মসীহ্ হওয়ার দাবি ততটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা ছিল পারিবারিক সম্মান। এমনিতেও যেহেতু জ্যেষ্ঠদের জন্য ছোটদের আনুগত্য করা কঠিন আর মসীহ্ মওউদ (আ.) জেঠীমা সাহেবার ছোট ছিলেন এবং সম্পত্তির অংশও নেন নি। [অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পত্তির কোন অংশই নেন নি।] তাই তাঁর পানাহারের ব্যবস্থাও তারই ঘর থেকে হতো (অর্থাৎ, জেঠীমার ঘর থেকেই খাবার আসতো।) এ দৃষ্টিকোণ থেকেও তিনি মনে করতেন, তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উপর অনুগ্রহ করছেন। মহিলাদের ভেতর প্রকৃতিগতভাবেই এমন ধ্যান-ধারণা নিহিত থাকে, তাই তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তার কাছে 'অনুগ্রহ প্রত্যাশী' মনে করতেন। [তিনি (আ.) সম্পত্তি নেন নি আর সম্পত্তি সব তারই অধিকারে ছিল- এ জন্য তিনি এমন চিন্তা করতেন না, বরং তিনি ভাবতেন, আমি খাবার পাঠাই, খাবার খাওয়াই এবং ব্যয়ভার বহন করি, তাই তাঁকে তিনি তার অনুগ্রহ প্রত্যাশী এবং নিজেকে অনুগ্রহকারী মনে করতেন।] হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর একটি আরবী কবিতায় লিখেছেন,

لُفَاظَاتُ المَوَائِدِ كَانَ أُكُلِيْ

وَ صِرْتُ اليَوْمَ مِطْعامَ الْاَهالِيْ

এর অর্থ হল, **এমন এক যুগ ছিল, যখন আমি অন্যদের পরিত্যক্ত রুটির টুকরো খেয়ে দিনাতিপাত করতাম, কিন্তু খোদা তা'লা এখন আমাকে এমন মহিমায় মহিমান্বিত করে দিয়েছেন যে, সহস্র-সহস্র মানুষ আমার দস্তরখানে এখন পেটপুরে খায়।**

এই পঙক্তিতে এ ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পত্তি ভাগ-বণ্টন করা হয়নি, বরং ভাই-এর কাছেই ছিল আর তাঁর ভেতর তা তদারকির কোন মনোবৃত্তিও ছিল না। তাঁর পিতাও বলতেন, তিনি বিষয়-সম্পত্তি শামলাতে পারবেন না। এমতাবস্থায় শ্রদ্ধেয়া জেঠীমার ঈমান আনা অনেক কঠিন বিষয় ছিল (কিন্তু পরে তিনি বয়আত করেছিলেন)। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা) বলেন, যুক্তি-প্রমাণ এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং পারিবারিক দৃষ্টিকোণ থেকে (এই পটভূমি) বর্ণিত হয়েছে। উভয়ের অবস্থান মালিক ও চাকরের ন্যায় ছিল। [অর্থাৎ, শ্রদ্ধেয়া জেঠীমা নিজেকে মালিক মনে করতেন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নাউযুবিল্লাহ্ চাকর মনে করতেন।] তিনি তাঁকে দরিদ্র এক মানুষ মনে করতেন, যিনি কোন কাজ করতেন না আর তাদের দেয়া খাবার খেয়ে দিনাতিপাত করতেন। এমতাবস্থায় তিনি তার বোনের মেয়েকে বিয়ে করতে

সফল হবেন, এটি তার জন্য ছিল অসহ্য। আবার যেহেতু তিনি সবচেয়ে বড় ছিলেন, তাই তার বিরোধিতা ছিল ভিন্ন মাত্রার। সেই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভয়াবহ বিরোধিতা ছিল। আত্মীয়-স্বজন তাঁর সাথে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিল আর তিনিও তাদের সাথে মেলামেশা করতেন না। বরং বংশের লোকদের বিরোধিতার চিত্র এমন ছিল যে, আমার শ্রদ্ধেয়া মা, হযরত আম্মাজান (রা.) বলতেন, হযরত সাহেবের নানার বংশের একজন প্রবীণ মহিলা ছিলেন। তিনি বলতেন, আমাকে কেউ চেরাগ বিবির ছেলেকে দেখতেও দেয় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চোর এবং ডাকাতদের মত পৃথক রাখা হত। কেননা, মনে করা হতো, তিনি বংশের জন্য কলঙ্ক বিশেষ। এমতাবস্থায় জেঠীমার আহমদীয়াত গ্রহণের ধারণা করাটা ছিল, বাহ্যতঃ এক অসম্ভব বিষয়। মানুষের হৃদয় পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু দেখার বিষয় হল, পরিস্থিতি কেমন ছিল? এমন পরিস্থিতিতে (তাঁর) প্রতি ইলহাম হয়, 'জেঠীমা এসেছেন'। শ্রদ্ধেয়া জেঠীমা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী ছিলেন। তাই এই শব্দগুলোর এ অর্থ ছিল, তিনি বয়আত করবেন তখন, যখন বয়আতকারীর সাথে তার সম্পর্ক হবে জেঠীমা'র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে যদি বয়আত করার থাকত, তাহলে ইলহামের শব্দ হতো 'ভাবী এসেছেন'। যেহেতু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাবী ছিলেন, তাই 'ভাবী এসেছেন'-এ ইলহামই হওয়া উচিত ছিল। আর যদি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর হাতে বয়আত করার থাকত, তাহলে ইলহাম হতো মসীহ্ মওউদের 'বংশের এক মহিলা এসেছেন'। কিন্তু 'জেঠীমা' শব্দটি বলছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুত্র যখন তাঁর খলীফা হবেন, তখন তাঁর হাতে তিনি বয়আত করবেন। কেননা, তাঁর সন্তানদের কারো যদি খলীফা না হওয়ার থাকত, তাহলে 'জেঠীমা' শব্দ বৃথা সাব্যস্ত হতো। তিনি বলেন, এই ইলহামে সত্যিকার অর্থে তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী অন্তর্নিহিত আছে। প্রধানতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সন্তানদের মাঝে কেউ খলীফা হবেন, দ্বিতীয়তঃ ঐ সময় শ্রদ্ধেয়া জেঠীমা আহমদীয়াত গ্রহণ করবেন আর তৃতীয়তঃ শ্রদ্ধেয়া জেঠীমায়ের বয়স সংক্রান্ত ইলহাম এটি। আর এটা এভাবে পূর্ণতা লাভ করে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিজের বয়স যখন প্রায় ৭০ বছর, তখন এমন এক ভদ্রমহিলা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, যিনি তখনই বয়সে তার চেয়ে বড় ছিলেন, তথাপি তিনি জীবিত থাকবেন এবং তাঁর বংশ থেকে এক খলীফা হবে, যার হাতে তিনি বয়আত করবেন। এত দীর্ঘ জীবন লাভ করা অনেক বড় কথা। মানবীয় চিন্তাধারা কোন যুবক সম্পর্কেও একথা বলতে পারে না যে, সে এত দিন জীবিত থাকবে, তবে বৃদ্ধা সম্পর্কে কীভাবে বলা যেতে পারে? (শ্রদ্ধেয়া জেঠীমা সম্ভবতঃ ১৯২৭ সনে ইন্তেকাল করেন।) অতএব, এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন। যেন তার বয়আত করা আর আমার যুগে বয়আত করা আর মসীহ্ মওউদের পুত্রদের মধ্য থেকে কারো খলীফা হওয়া, এরূপ বেশ কিছু ভবিষ্যদ্বাণী যেন এই দু'টি শব্দের মাঝে তুলে ধরা হয়েছে।" জেঠীমা আহমদীয়ত গ্রহণের পর ওসীয়্যতও করেছিলেন। আর এর পটভূমিও বিস্ময়কর। তিনি (রা.) বলেন, "আমি মনে করি, ঐতিহ্য এবং আবেগ অনুভূতি পুরোনো পরিবারগুলোতে যেমন পাওয়া যায়, সেই দৃষ্টিকোন থেকে এটি এক অসাধারণ পরিবর্তন যে, শ্রদ্ধেয়া জেঠীমা বয়আত করার পর

ওসীয়্যতও করেছেন। (শুধু বয়াআতই করেন নি, বরং ওসীয়্যতও করেছেন।) মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে পৈত্রিক কবরস্থানের পরিবর্তে অন্যত্র দাফন করার বিষয়ে প্রথমে তিনি বিরোধী ছিলেন। আর তখন তিনি সংবাদ পাঠান, তাঁকে যেন পৈত্রিক কবরস্থানের পরিবর্তে অন্য কোন স্থানে দাফন করা না হয়। কেননা, এটি এক ধরণের অসম্মান। আর এরপরও বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি এ সম্পর্কে আপত্তি করে বেড়াতেন। কিন্তু তার নিজের অবস্থা দেখুন! পরে তিনি নিজেই ওসীয়্যত করেন এবং বেহেশতী মকবেরায় সমাহিতা হন। একজন বিবেকবান মানুষের জন্য এটি অনেক বড় একটি নিদর্শন। আপাতঃদৃষ্টিতে এটি তুচ্ছ একটি বিষয়, যা এক ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এতে ইলহামের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার মত বেশ কিছু দিক অন্তর্নিহিত আছে।" **(খুতবাতে মাহমুদ, ১১তম খণ্ড, ২৫১-২৫৩)** বিরোধিতা সত্ত্বেও মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে তার এই দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল যে, তাকে পৈত্রিক কবর স্থানে দাফন করা উচিত। অথচ পরে তিনি নিজেই ওসীয়্যত করেন আর বেহেশতী মকবেরাতে কবরস্ত হন।

এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিল্লি সফরের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মানুষ যখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, ঐশী কার্যক্রম সম্পর্কে কখনোই সে এ চিন্তা করে না যে, এর ফলাফল প্রকাশ পাবে না। (নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা এর উত্তম ফলাফল প্রকাশ করবেন।) তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছিলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম। [তিনি (রা.) দিল্লির জামা'তকে সম্বোধন করে বক্তৃতাকালে এ কথাগুলো বলছিলেন] তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন দিল্লি এসেছিলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানকার ওলী-আওলিয়াদের মাযারে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দোয়া করেন আর বলেন, আমার এ দোয়া করার কারণ হল, এসব বুযূর্গের আত্মা যেন উদ্বেলিত হয়। আর এ যুগে আল্লাহ্ তা'লা তাদের হিদায়াতের জন্য যে নূর বা জ্যোতি প্রেরণ করেছেন, সেই নূর শনাক্ত করার ক্ষেত্রে তাদের বংশধর বঞ্চিত থেকে যাবে, এমন যেন না হয়। তিনি (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে এমন একদিন অবশ্যই আসবে, যখন আল্লাহ্ তা'লা এদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিবেন আর তারা সত্য গ্রহণ করবে। তিনি (রা.) বলেন, তখন যদিও আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এ কথার প্রভাব এখনো আমার হৃদয়ে বিদ্যমান। অতএব, এখানকার জামা'ত যদি নিজেদের চেষ্টা-প্রচেষ্টার কোন ভাল ফলাফল দেখতে চায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লার উপর নির্ভর করা উচিত। যে বিষয়কে আল্লাহ্ তা'লা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা হবেই হবে আর এমন একদিন অবশ্যই আসবে।" দিল্লি জামা'তের সম্বর্ধনার উত্তরে তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন। **(জামা'তে আহমদীয়া দিল্লি কে এড্রেস কা জওয়াব, আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৮৩-৮৪)**

অতএব, আজও দিল্লি জামা'তের জন্য আবশ্যক হবে, প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণী প্রচার করা। মাশাআল্লাহ্! প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে তবলীগে অনেক গতি সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে বিরোধিতাও রয়েছে। তাই তাদের মাঝেও এই

বাণী প্রচারের অনেক বেশি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দোয়া। এদিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজন রয়েছে।

একই ধারাবাহিকতায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ করে আরো বলেন, একটি দীর্ঘ নালা খনন করা আছে এবং তাতে বেশ কিছু ভেড়া শোয়ানো হয়েছে, প্রতিটি ভেড়ার সামনে একজন করে কসাই ছুরি হাতে নিয়ে জবাই-এর জন্য প্রস্তুত আর তাদের দৃষ্টি আকাশের দিকে, যেন তারা কোন নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলছেন, তখন আমি সেখানে পায়চারি করছিলাম, তাদের কাছে গিয়ে আমি বলি, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (সূরা আল্ ফুরকান: ৭৮) (অর্থাৎ, তুমি বল, তোমরা দোয়া না করলে আমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাদের মোটেও গ্রাহ্য করবেন না।) আর তখনই তারা ছুরি চালিয়ে দেয়। সেই ভেড়াগুলো যখন ছটফট করছিল, তখন যারা ছুরি চালিয়েছিল তারা বলে, তোমরা মল ভক্ষণকারী ভেড়া ছাড়া আর কিছুই তো নও। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, সেই দিনগুলোতে সত্তর হাজার মানুষ কলেরায় প্রাণ হারায়। অতএব, কেউ যদি কর্ণপাত না করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তার তোয়াক্কা করেন না আর তাঁর কাজ ব্যাহত হতে পারে না, তা হবেই হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।" তিনি (রা.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিনশ' বছর পর খ্রিষ্টধর্ম উন্নতি করে, কিন্তু আমাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয়, ঈসা নবীর যুগের অনেক পূর্বেই আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্। **(জামা'তে আহমদীয়া দিল্লি কে এড্রেস কা জওয়াব, আনোয়ারুল উলুম, ১২তম খণ্ড, পৃ. ৮৪)**

পাকিস্তানী মৌলবী, কোন ধর্মীয় নেতা বা জাগতিক কোন শক্তিই হোক না কেন, খোদার দৃষ্টিতে এদের কোনই মূল্য নেই। এরা তো ভেড়ার পালের মত। এরা কখনোই আহমদীয়াতের উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারবে না। কাজেই, আহমদীয়তের প্রচার এবং প্রসারের জন্য কেবল আমাদের মুবাল্লিগদের উপর নির্ভর করে বসে থাকলে চলবে না। নিজে যদি এ উন্নতির ভাগীদার হতে চান, বরং অবশ্যই হওয়া উচিত, তবে দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগী হতে হবে, আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে। এ বিষয়গুলোই আহমদীয়াতের বিরোধিতাও নির্মূল করার কারণ হবে আর আহমদীয়াতের উন্নতির ক্ষেত্রেও আমাদের অংশীদার বানাবে, ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর একটি গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লিগ জনাব সুফনী জাফর আহমদ সাহেবের জানাযা। গত ৮ নভেম্বর তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৪৫ সনের ১৮ আগষ্ট সুমাত্রার পাডাং-এ তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা যেয়নী দেহলান সাহেব ১৯২৩ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তিনি আরো দু'জন যুবকের সাথে সম্মিলিতভাবে সুমাত্রা এবং জাভায় তবলিগী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে সুফনী সাহেবের পিতা ইন্দোনেশিয়ার প্রথম যুগের মুবাল্লিগদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যেয়নী দেহলান সাহেবের তিন সন্তান ছিল। সুফনী যাফর আহমদ সাহেবকে ওয়াক্‌ফ করার পর জ্ঞানার্জনের জন্য জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়াতে পাঠান। সুফনী যাফর আহমদ সাহেব ১৭ জুলাই ১৯৬৩ সনে রাবওয়ায় আসেন এবং প্রায় ১১ বছর রাবওয়াতে অবস্থান করেন। জামেয়া আহমদীয়ায় পড়াশুনা করেন। ১৯৭৪ সনে লেখাপড়া শেষ করে ইন্দোনেশিয়া ফিরে যান। আর ইন্দোনেশিয়ার কালিমানটানে তার প্রথম পদায়ন হয়। এরপর তিনি

পশ্চিম জাভায় আঞ্চলিক মুবাল্লিগ ও আমীর হিসেবে জামা'তের সেবা করার তৌফিক লাভ করেন। পরে পূর্ব জাভা এবং পাপওয়াতে জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৫ থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত জাম্বিতে, ১৯৮৭ থেকে ৯১ সাল পর্যন্ত উত্তর সুমাত্রায় আঞ্চলিক মুবাল্লিগ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ থেকে ৯৭ সাল পর্যন্ত জামেয়া আহমদীয়া ইন্দোনেশিয়াতে ফিকাহ্‌র শিক্ষক হিসেবে ফিকাহ্‌শাস্ত্র পড়ানোর সৌভাগ্য লাভ করেন। এ সময় তরবীয়ত নও মোবাঈন বিভাগের দায়িত্বও তার উপর ন্যস্ত হয়। ১৯৯৭ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত লাম্পুঙ্গ-এ আঞ্চলিক মুবাল্লিগ নিযুক্ত হন। তার মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মসজিদ এবং মিশন হাউসের নির্মাণের কাজও তিনি করেন। ইন্দোনেশিয়ান ভাষায় নিম্নলিখিত চারটি পুস্তিকা লেখার সৌভাগ্য তিনি লাভ করেছেন। যাকাতের দর্শন, আল্লাহ্‌র পথে ত্যাগ স্বীকার, জানাযা এবং ইসলামে জিহাদের অর্থ। এই চারটি পুস্তক তিনি রচনা করেছেন। ২০০১ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। কিছুদিন থেকে তিনি বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। খিলাফতের সাথে তার পরম বিশ্বস্ততা এবং আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল। জামা'তের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ এক সেবক ছিলেন। পরিবার-পরিজনে স্ত্রী ছাড়াও এক কন্যা এবং দু'জন পুত্র তিনি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবাইকে আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন। পিতার মত পুণ্যে অগ্রগামী, বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী এবং আমলের দিক থেকেও উন্নত আহমদীতে পরিণত করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত